Vol. 1 | No. 1 | 1957

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি (খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী)

Volume	1
Issue	1
Year	1957
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আশুতোষ ভট্টাচার্য
Published online	June 15, 1957
DOI	10.62328/sp.v1i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v1i1.5
Pages	৬৮-৭৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি
(খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী)

Check for updates

আশুতোষ ভট্টাচার্য

সাহিত্য পত্রিকা
Shahitto Potrika

Online ISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 1
Number 1
Year 1957

সাহিত্য পত্রিকা: বর্ষা ১৩৬৪ (১৯৫৭)
বর্ষ: ১ সংখ্যা: ১ পৃষ্ঠা: ৬৮-৭৬

DOI 10.62328/sp.v1i1.5

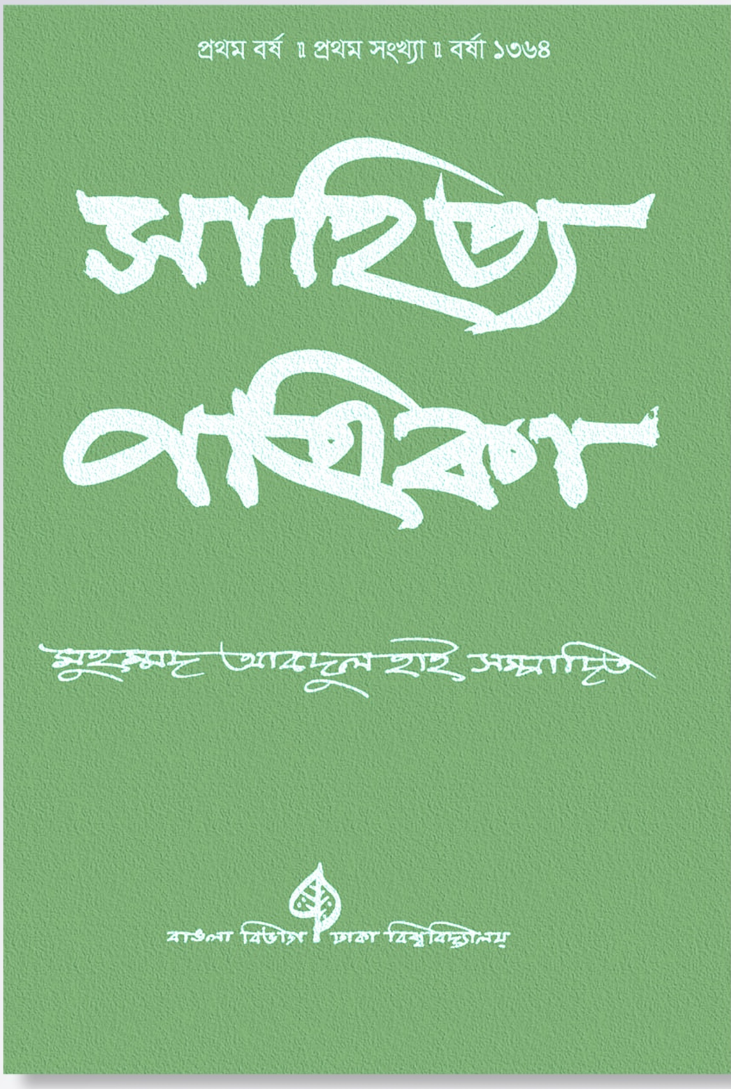

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি

(খোন্দকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী)

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য*

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহার ফলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের পরও মুসলমান সমাজের ভিতর দিয়াই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারাটি কোনও কোনও ক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষিত নব্য হিন্দু সমাজ যখন সেক্সপীয়র, রায়রণ, স্কট, মিলটন পাঠ করিয়া নিজের জাতীয় ঐতিহ্য বিস্মৃত হইয়াছে, তখনও এদেশের মুসলমান সমাজ দেশের জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যকে ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু সে দিন বাঙ্গালীর সম্মুখে জাতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করিবার কোনও মূল্য ছিলনা — সেই জন্য মুসলমান সমাজের এই প্রয়াস সেদিন দেশের শিক্ষিত জন-সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালেই পড়িয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে (১৮৫৩) যখন বাঙ্গালীর পাশ্চাত্য প্রভাবিত নূতন কাব্য-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে, তখনও একজন মুসলমান কবি বাংলার মধ্য যুগের ধারা অনুসরণ করিয়া একখানি কাহিনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কবির আজ পর্যন্তও বিশেষ কোনও পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু নানা দিক হইতে তাঁহার রচনার বিশেষ একটি মূল্য আছে বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি এখানে প্রকাশ করিতেছি।

এই কবির নাম সামসুদ্দিন সিদ্দিকি খোন্দকার। তাঁহার কাব্যের নাম ভাব লাভ। মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যে কবির আত্ম-পরিচয় দানের প্রথা অনুসরণ করিয়া তিনিও তাঁহার কাব্যে এইভাবে পরিচয় দিয়াছেন—

রাজধানী বর্ধমান তন্মধ্যে বাসস্থান
বারি সর্বমঙ্গলাতে ঘর।
ছিদ্দিকি পদ্ধতি ধরে খোন্দকারি পেশা করে
গোলাম ফরিদ খোন্দকার॥

*আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তিনি তাঁহার পিতার সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করিয়াছেন —

দেশখ্যাত নাম যার কি লিখিব গুণ তার
কেবা নাহি জানে চেনে তারে।
এলেমে আলেম তিনি ফকিরের চূড়ামণি
প্রকাশিত বাঙ্গাল ভিতরে।
তত্ত্বজ্ঞানী বধুঁ যাঁরা, দিবানিশি আসে তাঁরা,
সেবা করে তাঁহার চরণে।
হৃদয়ের রাজা তিনি, তাঁহারে সাধনে চিনি।
ফকির হইল কতজনে॥
শুন সবে সমাচার আমি মুর্খ পুত্র তার
আর দুই ভ্রাতা আছে যাঁরা।
তাঁহারা মৌলুবি হয়ে ভব-ভাব তেয়াগিয়ে
প্রভু ভাবে ভাবি হৈল তাঁরা॥

দেবতা, গুরু কিংবা রাজার আদেশে যেমন মঙ্গলা কাব্য রচিত হইত, এখানেও কবি তাঁহার কাব্য রচনার মূলে পিতার আদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সুন্দর বিদ্যার পুথি কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি
ভারত যেমন রচেছিলো।
তব আজ্ঞা অনুসারে ভাবলাভ পুথি ক'রে
সেই মত ছিদ্দিকি রচিলো॥

কবি বর্ধমানাধিপতি মাহতাবচন্দ্র বাহাদুরের প্রজা ছিলেন, তাঁহার কাব্যে তাঁহারও সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন।

ধর্মাবতার রাজাধিরাজ নৃপতি।
নামেতে মাহতাব চন্দ্র বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
প্রতাপে দ্বিতীয় ইন্দ্র রাজার প্রধান।
রূপে গুণে নৃপবর রবির সমান॥
অসহ্য কৌরব যিনি ধর্মে যুধিষ্ঠির।
দানে দাতা কর্ণ মত দয়ার শরীর॥

প্রজার পালন করে পুত্রের সমান।
অকাতরে করে দান সমুদ্র প্রমাণ॥
অতি ক্ষুদ্র প্রজা হয়ে কি যশ গাইবো।
ছোট মুখে বড় কথা কেমনে বলিবো॥

মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের কবিগণও যে রাজার রাজ্যে বাস করিতেন, তাঁহাদের প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। এই ভাবেই কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, কবিন্দ্র পরমেশ্বর, দ্বিজ মাধব প্রভৃতি মধ্যযুগের কবি গৌড়ের সুলতান-দিগের গুণ-কীর্তন করিয়াছেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের মুসলমান কবিগণ কাব্য রচনার যে ধারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে স্বভাবতঃই বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমান কবিদের রচনার কোনও যোগ ছিলনা। চট্টগ্রাম ও আরাকানের মুসলমান কবিগণ যদিও লৌকিক প্রণয়াখ্যানমূলক কয়েকখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি মুসলমান ধর্মবিষয়ক রচনাও তাহাতে স্থান লাভ করিয়াছিল। মুসলমান ধর্ম বিষয়ক মৌলিক রচনার এই অঞ্চলে ব্যাপক অনুশীলন হইত, তাহার ফলে এই অঞ্চলের মুসলমান কবিগণ তাঁহাদের বাংলা রচনায় আরবি ও পারসী শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ করিতেন। অবশ্য দৌলৎ কাজী ও সৈয়দ আলাওলের রচনা এই প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্ত। ইহার কারণ, ইহাদের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব — অর্থাৎ ইহারা যখন বাংলা সাহিত্যের অমুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তখনও বাংলা রচনায় আরবি এবং পারসী শব্দ তত ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইত না। তাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবেও সমসাময়িক কালে প্রচলিত বাংলা কাব্য রচনার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সৈয়দ আলাওলের পরবর্ত্তী কালে চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে যে সকল মুসলমান কবি বাংলা কাব্য রচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ধর্মীয় প্রেরণায় এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মের কথা তাঁহাদের রচনার মধ্যে থাকিত বলিয়া স্বভাবতঃই তাহাতে মূল গ্রন্থের শব্দ ব্যবহৃত হইত। সৈয়দ আলাওলের পরও এই অঞ্চলের কবিগণ লৌকিক প্রণয়-ঘটিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা এবিষয়ে প্রত্যেকেই আরবি কিংবা পারসী কথাসাহিত্যের নিকট ঋণ স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। সেই সূত্রেই আরবী-পারসী শব্দ তাঁহাদের রচনায় স্থান লাভ করিয়াছে।

চট্টগ্রাম ও আরাকানের মত বাংলা দেশের আর কোনও অঞ্চলে মুসলমান কবিদিগের সাহিত্য রচনার বিশিষ্ট একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমান কবিগণ যে সকল কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা তাহাদের কোনও সুনির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়া রচিত হয় নাই — বরং সমসাময়িক কালের প্রতিভাবান হিন্দু কবিদিগের রচনার আদর্শ অনুকরণ করিয়াই রচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের পর লৌকিক প্রণয়াখ্যানমূলক কাব্য রচনায় পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু কিংবা মুসলমান কবি কেহই ভারতচন্দ্রের প্রভাব কিছুতেই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। কবি সমছুদ্দিন সিদ্দিকিও সকল দিক হইতেই ভারতচন্দ্রের প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম ও আরাকানের মুসলমান কবিগণ যেমন তাঁহাদের লৌকিক প্রণয়াখ্যানমূলক কাব্যরচনায় প্রধানতঃ বাংলাদেশের সমাজ পরিত্যাগ করিয়া আরব্য ও পারস্য কথাসাহিত্যের নিকট ঋণী হইয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের কবি সমছুদ্দিন তাহার পরিবর্তে বাংলা দেশেই প্রচলিত একটি রূপকথাকে কাব্যরূপ দান করিয়াছেন। অবশ্য তিনি নানা দিক হইতে ইহাকে পল্লবিত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার মূল বিষয় বস্তু ও আঙ্গিক রচনায় বাংলা দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা আখ্যান কাব্য রচনার ধারা তাঁহার রচনার ভিতর দিয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

'ভাব লাভ' কাব্যের কাহিনীটি এই—

কাশ্মীর-রাজ নিঃসন্তান, সে'জন্য তাঁহার মনে দুঃখের অন্ত নাই। মন্ত্রীকে ডাকিয়া তিনি একদিন বলিলেন, 'যাহার পুত্র নাই, তাহার ধন দৌলত বৃথা। আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইব এবং ভগবানের নাম করিব।"

মন্ত্রী তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন, বলিলেন, 'বনে বনে ঘুরিয়া ভগবানের নাম করিয়া কি হইবে? ভক্তি থাকিলে ঘরে বসিয়াই তাঁহার নাম করা যাইতে পারে। তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে'। রাজা বলিলেন, 'বেশ তবে তাহাই করিব'। অল্পদিনের মধ্যেই রাজা ও মন্ত্রীর একটি করিয়া পুত্র হইল। উভয়ের পিতারই পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে উভয়ে আজীবন সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইল। দিনে দিনে তাহারা এক সঙ্গে বাড়িতে

লাগিল। উভয়ে এক সঙ্গে শিকার করিত। একদিন মন্ত্রিপুত্র শিকারে গিয়া তাহার পালিত রাজপক্ষীর সন্ধান করিতে গেলে তাহাকে একাকী নিদ্রিত অবস্থায় পাইয়া পরীগণ রথে করিয়া রাজকন্যা নূরজাহাঁর নিকট লইয়া গেল। নূরজাহাঁর এক কুঁজা স্বামী ছিল, কিন্তু মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া পরস্পর সুগভীর প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িল। পরীগণ পুনরায় মন্ত্রিপুত্রকে রাজপুত্রের নিকট আনিয়া দিয়া গেল । নূরজাহাঁ মন্ত্রিপুত্রের জন্য প্রেমোন্মাদিনী হইয়া পুরুষের ছদ্মবেশে তাহার অনুসন্ধানে কাশ্মীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার রূপ দেখিয়া নগরের নারীগণ মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রণয় নিবেদন করিল। কাশ্মীরের রাজপুত্র তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবার জন্য মন্ত্রি পুত্রকে পাঠাইলেন। নূরজাহাঁ তাহাকে চিনিতে পারিল, কিন্তু মন্ত্রিপুত্র তাহার পুরুষ বেশ দেখিয়া চিনিতে পারিল না। নূরজাহাঁ নিজের পরিচয় গোপন করিয়া রাজপ্রসাদের আতিথ্য গ্রহণ করিল, কিন্তু রাত্রিকালেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া স্বগৃহের দিকে যাত্রা করিল, যাইবার সময় একটি সঙ্কেত রাখিয়া গেল। নূরজাহাঁ চলিয়া যাইবার পর মন্ত্রিপুত্রের সকল কথা মনে হইল। রাজপুত্রের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া রাজপুত্র নূরজাহার প্রতি অনুরাগাসক্ত হইয়া মন্ত্রিপুত্রের সঙ্গে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। সন্ধান করিতে করিতে তাহারা নূরজাহার পিতৃরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব নির্দিষ্ট সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া রাজপুত্র নূরজাহার নিকট পত্র প্রেরণ করিল, পত্র পাইয়া নূরজাহা মন্ত্রিপুত্রের কথা বিস্তৃত হইয়া রাজপুত্রের প্রতি আসক্ত হইল। পূর্বেই রাজপুত্রকে দেখিয়া সে ভুলিয়াছিল। রাজপুত্র ও নূরজাহার মিলন হইল, তাহাদের নিয়মিত গোপন মিলন মান-অভিমান চলিতে লাগিল। মন্ত্রিপুত্রকে হত্যা করিবার জন্য নূরজাহাঁ একদিন তাহার খাদ্যে বিষ মিশাইয়াছিল, এক কাক সেই বিষমিশ্রিত খাদ্য খাইয়া মরিয়া গেল। রাজপুত্র চোখের সম্মুখে ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া নূরজাহাঁকে এক রাক্ষসীর বেশে সাজাইয়া নিদ্রিত অবস্থায় বনে পরিত্যাগ করিল। নূরজাহাঁ অনুতপ্ত হইলে পুনরায় রাজপুত্র তাহাকে গ্রহণ করিয়া তিনজনে স্বদেশোভিমুখে ফিরিতে মনস্থ করিল। পথিমধ্যে এক পক্ষী ভবিষ্যদ্বাণী করিল যে রাজপুত্র দেশে ফিরিবার পথে মারা যাইবে, তবে যদি কেহ একটি খাল পার হইবার সময় পিছন হইতে তাহার ঘোড়ার পা কাটিয়া দিতে পারে, এবং তাহার রাজপ্রাসাদে

প্রবেশ করিবার সময় প্রাসাদের সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, তবে সে বাঁচিয়া যাইবে; কিন্তু সেই ব্যক্তি এই পক্ষীর দৈববাণীর কথা যদি রাজপুত্রের নিকট প্রকাশ করে তবে সে পাষাণ হইয়া যাইবে। কিন্তু রাজপুত্র ও নূরজাহার যে পুত্র হইবে তাহাকে কাটিয়া তাহার রক্ত পাষাণের গায়ে ঢালিয়া দিলে সে পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবে। মন্ত্রিপুত্র ব্যতীত পক্ষীর এই ভবিষ্যদ্বাণী আর কেহই শুনিল না। রাজপুত্রের স্বদেশ যাত্রা কালে মন্ত্রিপুত্র এই কার্যগুলি পালন করিয়া রাজপুত্রকে বাঁচাইল। কিন্তু রাজ প্রাসাদের সিংহদ্বার ভাঙ্গিবার জন্য রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রকে বধ করিতে উদ্যত হইল। মন্ত্রিপুত্র বাধ্য হইয়া পক্ষীর ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবা মাত্র পাষাণে পরিণত হইয়া গেল। নূরজাহা বন্ধুর জন্য বন্ধুর আত্মত্যাগের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং নিজের যখন পুত্র জন্মিল তখন সেই পুত্রকে কাটিয়া তাহার রক্তে মন্ত্রিপুত্রকে বাঁচাইল। মন্ত্রিপুত্র বাঁচিয়া উঠিয়াই সেই কাটা শিশু কোলে লইয়া তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বনে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। সেখানে এক পরী ও এক যাদুকরীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। যাদুকরী রাজপুত্রকে বাঁচাইয়া দিল। পরী এবং যাদুকরী উভয়কেই বিবাহ করিয়া লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া মন্ত্রিপুত্র নূরজাহাঁর কোলে তাহার শিশুপুত্রকে জীবিত অবস্থায় ফিরাইয়া দিল।

রূপকথা মৌখিক (oral) সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত (written) সাহিত্য হইতে ইহার কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। কবি সমছুদ্দিন রূপকথার মৌখিক একটি রূপকে লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার ফলে তাঁহার রচনায় মূল কাহিণী হইতে কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে। রূপকথার চরিত্রগুলি নির্বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়া থাকে, যেমন, এক রাজা, রাজপুত্র কিংবা মন্ত্রিপুত্র; ইহাদের বাহারও কোনও নাম থাকে না। কিন্তু কবি সমছুদ্দিন এই কাহিণীর একটি লিখিত রূপ দিতে গিয়া ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি নাম দিয়ে ইহাদের এক একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন, দেশের নাম দিয়াছেন কাশ্মীর এবং তাহার রাজার নাম দিয়াছেন মহম্মদ শাহ্। রাজপুত্র এবং মন্ত্রিপুত্র উভয়েরই একটি করিয়া নাম দিয়াছেন, যেমন, সৈয়দ আহম্মদ ও নূর আহম্মদ। রাজকন্ঠার নাম দিয়াছেন নূরজাহাঁ। বলা বাহুল্য প্রচলিত রূপকথায় এই নামগুলি নাই। কিন্তু এই চরিত্রগুলির মুসলমান নাম দেওয়া সত্ত্বেও সর্বাংশেই যে কাহিণীটিকে মুসলমান ভাবাপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারা যায়না। কারণ, রাজ ও মন্ত্রিপুত্রের পঞ্চম মাসে হিন্দু

সংস্কারানুযায়ী অন্নপ্রাশনের কথা, ইন্দ্রপুরী, হিন্দু সাধু সন্ন্যাসি ও তাহাদের যোগ সাধন ইত্যাদির কথা আছে। অথচ আর এক দিক দিয়া রাজকন্যা নূরজাহাঁর চরিত্রের উপর মুসলমান কেচ্ছা সাহিত্যের নায়িকা চরিত্রের পরিপূর্ণ প্রভাব অনুভব করা যায়। বিশেষতঃ কবি-পরিকল্পিত এই কাহিণীর মধ্যে একটি মাত্র রূপকথাই যে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নহে — বাংলাদেশেরই একাধিক রূপকথার প্রভাব ইহার উপর কার্যকরী হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশে সুপরিচিত রূপকথা মধুমালার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়, অথচ শেষাংশে স্বতন্ত্র আর একটি রূপকথা ইহার উপজীব্য হইয়াছে। বিষয় বস্তুর উপর বিভিন্ন দিক হইতে এই সকল লৌকিক সাহিত্যের প্রভাবের কথা বাদ দিলেও ইহার রচনায় এবং কয়েকটি চিত্রপরিকল্পনায় ইহার উপর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভাষার দিক হইতে ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাবও মধ্যে মধ্যে অনুভব করা যায়। অতএব দেখিতে পাওয়া যায় কবি সমছুদ্দিন কেবল মাত্র আত্মকেন্দ্রিক ভাব-সাধক ছিলেন না, তিনি সমগ্র সমাজের রস-চেতনা নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দরের অনুরূপ চিত্রগুলি যেখানে কবি পরিবেশন করিয়াছেন, সেখানে স্বভাবতঃই তিনি ভাব ও বিষয় বস্তুতে কোনও মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রেও স্বাধীন সঙ্গীত রচনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা সে যুগেও বিরল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিধুবাবু, দাশুরায় প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতাদিগের সঙ্গীতের সঙ্গে কবি ছিদ্দিকির নিম্নোধৃত সঙ্গীতটির তুলনা করা যাইতে পারে—

মনোচোরা মনোচুরি ক'রে মোর কোথা গেলো॥

না হেরে এমন রূপ প্রাণে বাঁচা ভার হলো॥
গতনিশি প্রাণশশী
দেখা দিলো মোরে আসি
হাসিখুসি করে শশী, পুন কোথা লুকাইলো॥
হায় হায় মরি মরি
হেনরূপ নাহি হেরি
মনে এই সাধ করি লয়ে মাখি পদধূলো॥

ঊনবিংশ শতাব্দী প্রধানতঃ বাংলা সাহিতের ইতিহাসে গীতিকাব্যের যুগ। পাশ্চাত্য প্রভাবিত সাহিত্য কিংবা দেশীয় প্রাচীন সাহিত্য উভয় ধারাতেই তখন গীতিকাব্য রচনার নানা বৈচিত্র দেখা দিয়াছে। তবে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত ধারাটি নূতন আদর্শের স্পর্শে নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু প্রাচীন ধারাটি কেবলমাত্র এক পর্যুষিত রীতির অনুসরণ করিয়া বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবি ছিদ্দিকি এই বিষয়ক প্রাচীন ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনায় শিল্প ও রসবোধের পরিচয় প্রকাশ পাইলেও ইহার মধ্য দিয়া তিনি প্রাণ-শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি এ'কথা সত্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দেশীয় পদ্ধতির গীতি রচনায় তাঁহার একটি স্থান আছে।

ভারতচন্দ্র ব্যতীতও কবি ছিদ্দিকি তাঁহার কাব্য রচনার বহিরঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাবকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। নিম্নোধৃত অংশে ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,

ভাব লাভ নামে পুথি হয়েছে নূতন।
অভাব ভাবে ভাব তাহে বিরচণ॥
ভাবের হইয়ে ভাবি ভব-পারাবারে।
ভয়-যুক্ত ভৃত্য হয়ে ভজিবেক তাঁরে॥
এ'ভাব এমন ভাব ভাবের ভবন।
ভক্ত হয়ে ভক্তি কর করিয়া ভ্রমণ॥

এই অংশের রচণায় উচ্চাঙ্গের কোনও শক্তি প্রকাশ পায় নাই। যে গীতি-গুণ কবির পূর্বোধৃত সঙ্গীতটির ভিতরও প্রকাশ পাইয়াছে, এখানে তাহার অভাব আছে। তথাপি সমসাময়িক কালের একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে অনুকরণ করিবার স্বাভাবিক স্পৃহা হইতেই কবি ছিদ্দিকি তাঁহার রচনায় এই শ্রেণীরও কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ, তাঁহার কাব্যের গীতিধর্মতা বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর- গুপ্তের অনুপ্রাস ব্যবহারের ফলে তাঁহার রচনা স্থানে স্থানে কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে ।

কবি সমছুদ্দিন ছিদ্দিকি 'ভাব লাভ' ব্যতীতও আর একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম 'শুরতজান'। ইহার কাহিণীও হিন্দু জনশ্রুতিমূলক (tradi-

tional)। এক স্বর্গনর্তকীর সঙ্গে একজন মর্তলোকের রাজপুত্রের প্রণয়-বৃত্তান্তই ইহার ভিত্তি। কবি ছিদ্দিকি ইন্দ্রসভার নর্তকীর নাম দিয়াছেন শুরতজান এবং মর্তলোকের রাজপুত্রের নাম দিয়াছেন দেলারাম। তবে তাঁহার দেশ ভারতবর্ষের পরিবর্তে ইরাণ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। শুরতজানের প্রতি দেবরাজ ইন্দ্রের অভিশাপের কথা ইহাতে বর্ণিত আছে। অতএব একটি মাত্র চরিত্রের নাম পরিবর্তন ব্যতীত ইহাতে আর বিশেষ কোনও পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। অনুরূপ বিষয় বস্তু লইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা সাহিত্যে কয়েকখানি নাটক রচিত হইয়াছিল। তবে বিংশ শতাব্দীতে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ কর্তৃক রচিত এই বিষয়ক নাটক 'কিন্নরী' মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনয়গুণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

উপরে কবি সমছুদ্দিন ছিদ্দিকি সম্পর্কে যে আলোচনা করা গেল, তাহা হইতে স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মধ্যযুগের বাংলায় প্রধানতঃ আরাকান এবং চট্টগ্রামে যে মুসলিম কবিদিগের একটি ঐতিহ্যের ধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তিনি তাহা অনুসরণ করিয়া আবির্ভূত হন নাই। সে যুগে উত্তর বঙ্গে এবং দক্ষিণ বঙ্গেও কয়েকজন মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম কিংবা কারবালা যুদ্ধ-বিষয়ক বর্ণনা যেমন উত্তর বঙ্গের মুসলমান কবিদিগের উপজীব্য ছিল, গাজি, বনবিধি প্রভৃতি মুসলমান ধর্মবিষয়ক লৌকিক বৃত্তান্ত ও দক্ষিণ বঙ্গের মুসলমান কবিদিগের উপজীব্য ছিল। পশ্চিম বঙ্গের যে অঞ্চলে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই অঞ্চলে মুসলমান কবিদিগের নিজস্ব সম্প্রদায়গত কোনও ঐতিহ্য কোনদিনই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অতএব কবি ছিদ্দিকি নিজস্ব সমাজের সুনির্দিষ্ট কোন আদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন নাই। পশ্চিম বঙ্গের জনপ্রিয় হিন্দু কবিদিগের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি বাংলার নিজস্ব জাতীয় রসোপকরণকেই তাঁহার কাব্যের উপজীব্য করিয়া লইয়াছেন। অতএব বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় তাঁহার রচনার স্থান নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে আনিয়া সীমাবদ্ধ করিলে তাঁহার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায় না।